ujari
Anjali
Saraswati Puja Issue, 2006

রংবাহার

প্রসেনজিৎ দত্ত

রিষড়ায় আরতিদের বাড়ীটা ছিল যেন এক খুশীর উৎস। একটু পুরণো আমলের হলেও বাড়ীটার সঠিক যত্ন নেওয়ার ফলে পুরণো বলে মনেই হতো না। কোথাও কোন ফাটল নেই, প্রতি দুবছর অন্তর অন্তরই তার মেরামত হয়ে রং হতো। আরতির দাদু করেছিলেন বাড়ীটা এবং এই ছিল তাঁর প্রাণ। সত্যি, দেখবার মতো করে রেখেছিলেন বটে বাড়ীটাকে। অট্টালীকা না হলেও বেশ বড়ই ছিল সেটা। চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঢুকেই বাগান, তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে বাড়ীর সিঁড়ি পর্যন্ত্য। গাছগাছড়ার শখ ছিল ভদ্রলোকের - তাই একদিকে একটা গ্রীণহাউসও করেছিলেন। কত রকম দেশ বিদেশের গাছপালা ছিল তাতে। বাগানের অন্য প্রান্তে ছিল নানা রঙ বেরঙের ছোট ছোট ফুলের গাছ - দূর থেকে দেখে মনে হতো কে যেন একটা রংমেশালী মখমলের গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। আর ছিল একটা চন্দ্রমল্লিকা গাছ। তাতে যখন ফুল ফুটত, তার রুপ রস গন্ধে চারদিকটা মেতে উঠত।

আরতির জন্ম অবশ্য হয়নি এই বাড়ীতে - ওর জন্ম জব্বলপুরে, জীবনের প্রথম ভাগটাও কেটেছে সেখানেই। ওর বাবা ভারতীয় সেনা বিভাগে কাজ করতেন। বদলির চাকরি - দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত বদলি হয়ে আসলেন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। এর আগে আরতিরা কলকাতা বা তার আশেপাশে বিশেষ থাকে নি - তাই এদিকে এলে ওরা ওই রিষড়রার বাড়ীতেই এসে উঠত। কলকাতার বাসস্থান বলতে ছিল ওই বাড়ীই। তাই বদলি হওয়ার পরে আরতির দাদু দিদার অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন ওর বাবা ওখানেই থাকতে। ঠিক করলেন, কলকাতায় একটা বাড়ী করে উঠতে পারলে পরে সেখানে চলে যাবেন।

ভারী মজার মানুষ ছিলেন আরতির দাদু। গল্প করতে আর গল্প শুনতে ভালোবাসতেন খুবই। মাঝে সাঝেই তাঁর দরাজ হাসির শব্দে কেঁপে উঠত যেন বাড়ীটা - মনে হতো সেও যেন সেই হাসির তালে তালে তাল মিলিয়ে চলেছে। বাড়ীর ভেতরে অবশ্য বেশিক্ষণ থাকতে চাইতেন না - বাগান করার নেশায় বেড়িয়ে পড়তেন। বাইরেটা যেমন সাজিয়ে রেখেছিলেন তিনি, ভেতরটা তেমনি সাজিয়ে গুজিয়ে ছিমছাম রেখেছিলেন আরতির দিদা।

আর আরতি? ফুলের মতো মেয়ে ছিল সে। মনে হতো ভগবান যেন ওকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি কি তা সকলকে বোঝানোর জন্য। ও যখন হাসত, মনে হতো চারিদিকে একটা খুশীর জোয়াড় বয়ে চলেছে। আরতির মা ছিলেন নাচের শিক্ষিকা। তাই স্বাভাবিকভাবেই খুব ছোটবেলা থেকেই মায়ের তত্ত্বাবধানে এক নিপুণ শিল্পী হয়ে উঠেছিল সে। বিশেষভাবে, কত্থক ও মণিপুরী নৃত্যে খুবই পারদর্শী ছিল ও। এত ভালো নাচ শেখাতেন ওর মা, আশেপাশে ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে মেয়েরা আসতো তাঁর কাছে নাচ শিখতে। ফলে, সারাদিনই চলতো নাচের আসর বাড়ীর বড় উঠোনটাতে, আর আরতি কলেজ থেকে ফিরেই যোগ দিত সেই আসরে। বিকেলের জলখাবারটা পর্য্যন্ত খাওয়ার তর সইতো না তার। সব মিলিয়ে বাড়ীটাতে যেন সবসময় একটা জীবনের উচ্ছ্বাস বয়ে চলতো।

আরতির বাবা ছিলেন খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। খুব সম্ভবত সৈন্যবাহিনীর সাথে অত বছর যুক্ত থাকার ফলেই ওঁর আচার ব্যবহারে একটা কড়া মেজাজী ভাব এসে গিয়েছিলো। তাই উনি যখন বাড়ীতে ঢুকতেন, হঠাৎ যেন সবকিছু স্তব্ধ হয়ে যেত। এমনকি, যেসব মেয়েরা নাচ শিখতে আসতো, মনে হতো তারাও যেন তখন পালাতে পারলে বাঁচে। শোনা যেত, চাপা গলায় আরতির মা তাদের বলছেন, 'আজকের মতো এই পর্য্যন্তই, তোমরা আবার কাল এসো একই সময়ে।' আরতিও তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে গিয়ে বই নিয়ে বসতো। কেমিষ্ট্রি অনার্সের ছাত্রী ছিলো সে, কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। যে কোন কারনেই হোক, রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি চিরকালই ওর একটা দুর্বলতা ছিল। পড়াশোনায় বরাবরই ভালো ছিলো ও, তাই প্রেসিডেন্সীতে পড়ার সুযোগ পেতে বেশী বেগ পেতে হয়নি। আজ ওদের ক্লাসে স্পেক্ট্রোফোটোমেট্রি নিয়ে পড়ানো হয়েছে, ওর প্রিয় বিষয়, কিন্তু এখন বাবার ভয়ে পড়তে বসে সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। বাবা অবশ্য আজ কাউকে কিছু বললেন না, সোজা গিয়ে স্নানে ঢুকলেন। খুব পরিশ্রম করে ফিরেছেন, প্রচুর ফিল্ড ওয়ার্ক ছিলো আজ। মানুষটা কিন্তু ছিলেন ভারী অদ্ভুত। বাইরেটা ওঁর ছিল যেমন কড়া, ভেতরটা যেন ছিলো খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়ানো। স্নান সেরে ফিরে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলেন। একটু পরে আরতির মা ঢুকলেন হাতে চা জলখাবার নিয়ে। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বাবা বললেন, 'পিউ কোথায়?' আরতির মা বললেন, 'তোমার ভয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়াশোনা করছে'। একগাল হেসে বাবা বললেন, 'না, না, ওকে আসতে বলো'। আরতি ঢুকলো ঘরে। প্রথমে একটু ভয়ে ভয়ে, কিন্তু বাবার মুখে হাসি দেখে ওর মুখেও একটা হাল্কা হাসির অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। তারপর বাবা যখন হাসতে হাসতে বললেন, 'কিরে, পড়া হোলো?' আর থাকতে না পেরে মুক্তোর মতো দাঁতগুলো হঠাৎ ওর ঠোঁটের নিচে থেকে প্রস্ফূটিত হয়ে ওও হাসতে শুরু করলো। মনে

হোলো, কি করে যেন হঠাৎ সহস্র ঝর্ণাধারা একত্রিত হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো।

আরতিদের বাড়ীতে যখন পূজো হতো, ও সাধারণতঃ বাড়ীতে থাকতে চাইতো না। আশেপাশের কোনো বান্ধবী বা আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে গিয়ে সময় কাটাতো। যে কোনো কারনেই হোক, ছোটোবেলা থেকেই ওর পৌত্তলীকতায় ছিল ঘোর আপত্তি। তার মানে এই নয় যে ও ভগবানে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু ওর মনে হতো যে ভগবানের স্বরুপ নিজের মনের মধ্যে, মূর্তি বানিয়ে তার প্রতিরুপ ব্যাক্ষ্যা করতে চাওয়া অন্যায় এবং অবিবেচনীয়। তাই কলেজের ক্যান্টীনে পদার্থবিদ্যার ছাত্র ও কলেজের ক্রিকেট ক্যাপটেন শান্তনুর সাথে হঠাৎ একদিন এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে কথা কাটাকাটি হয়ে ওর মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। রাগে, অভিমানে ওখান থেকে বেড়িয়ে পড়ে সোজা ক্লাসে চলে এলো ও। শান্তনু ওর ব্যবহারে অবাক হলেও হার স্বীকার করে নিতে রাজী হলো না। কিন্তু বুঝল, এই বিষয়ে আরতির সাথে সোজাসুজি ভাবে কথা বলে কোন লাভ হবে না। আরতির এ ব্যাপারটা ওর মনের চিন্তাধারার সাথে এতো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে, যেন ওর অস্তিত্বই তার ওপর নির্ভরশীল। ও ঠিক করলো, এ বিষয় নিয়ে আরতির সাথে আর তর্কে জড়াবে না।

ভারী ভালো লাগতো আরতিকে ওর। সবচেয়ে ভালো লাগতো, অত রুপের ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও তার জন্য এতটুকু অহংকার ছিলো না ওর মনে। বরঞ্চ, মনে হতো ওই অপূর্বতার মধ্যে যেন কিসের একটা দুঃখ জড়িয়ে থাকতো। ওর ইচ্ছে করতো যেন সারাদিন একমনে তাকিয়ে থাকে ওর ওই দেবীপ্রতিম মুখটার দিকে। জানতে ইচ্ছা করতো, যদি সত্যিই আরতির মনে কোনো দুঃখ থেকে থাকে, তবে তার সূত্রটা কী। স্বাভাবিক কারনেই ক্লাসের ছেলেরা এগিয়ে আসতো আরতিকে সব ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। অথচ, কেন জানি মনে হতো, সে যেন শান্তনুর সাথেই কথা বলে সবচেয়ে খুশি হতো। এসে এসে মজা করে বলত, কেমিষ্ট্রি ল্যাবে প্রায় দিনই কেউ না কেউ এসে ওর এক্সপেরিমেন্টগুলো করে দিতে চাইতো। শান্তনুর একটা অদ্ভুত গুণ ছিলো, খুব ছোটবেলা থেকেই নিপুণ হাতে নানা দেবদেবীর মূর্তি গড়তে পারতো। এছাড়াও ওর ভালো গানের গলা ছিলো। কিন্তু ওর মনে হতো সেই গুণ লোক সমখে প্রকাশ করার উপযোগী পর্যায়ের নয়। অথচ, কাউকে এ বিষয়ে কিছু না বলা সত্ত্বেও আরতির কানে একদিন কীভাবে যেন ওর এই গুণের কথা ভেসে এলো। ব্যস, জেদ ধরে বসলো, ওদের রিষড়ার বাড়ীতে ওকে একদিন আসতেই হবে, ওখানে গানের আসর বসবে। শত ওজর আপত্তি সত্ত্বেও রাজী হতে হলো শান্তনুকে। ঠিক হলো পরের শণিবার আরতিদের বাড়ীতে যাবে ও।

বাড়ীটাতে ঢুকে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল শান্তনু। এতো সুন্দর বাড়ী সত্যিই ও আগে চোখে দেখেনি। বাগানে কর্মরত আরতির দাদুর সাথে দেখা হলো - বললেন, আরতির থেকে শুনেছেন ওর আসার কথা। পদার্থবিদ্যার ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও নানা বিষয়ে জ্ঞান ছিলো শান্তনুর। এমনকি, বাস্তুশাস্ত্র সম্বন্ধেও জানতো সে। দাদুর সাথে গল্পে মশগুল হয়ে উঠলো ও। এমনকি, ওনার সাথে গিয়ে ওনার গ্রীণহাউসটাও দেখে আসলো। গাছের ব্যাপারে ওর এত জানার, বোঝার ইচ্ছা দেখে ভীষণ খুশি হলেন উনি। ওদের কথাবার্তা ও হাসির আওয়াজ শুনে বেড়িয়ে এলো আরতি। আজ ওকে যেন আরো বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। এও কি সম্ভব? মাঝখান থেকে সিথি করে কাঁধ পর্যন্ত্য আঁচড়ানো চুল, রোদ লেগে ঝলমল করছে। গলাটা ঘিরে সাদা মুক্তোর মালা, কানে মুক্তোর দুল, আর মুখে সেই মুক্তো ঝরানো হাসি। একবার তাকালে যেন আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। ওর সাথে ভেতরে গিয়ে ওর বাবা মাকে প্রণাম করলো শান্তনু। গানের আসর শুরু হলো। আরতিদের পাড়ার একটা মেয়ে সঙ্গত করলো ওর। ধীরে ধীরে জমে উঠল গান। আরো কয়েকজন যোগ দিলো সেই আসরে। হঠাৎ নিজের অজান্তেই সেই গানের তালে তালে নাচতে শুরু করলো আরতি। সে যেন এক অপূর্ব সমন্বয়ের সৃষ্টি হলো। সকলের বাহবা ও বয়োঃজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ কুড়ালো দুজনেই। নিজের সুপ্ত প্রতীভার সম্মুখীন হয়ে নিজেই অবাক হয়ে গেলো শান্তনু। আর আরতির নাচের মাধুর্য্যে তার বারে বারে মনে হতে লাগলো সে যেন এক পরীর রাজ্যে পৌছে গেছে। ট্রেনে করে বাড়ী ফিরতে ফিরতে শুধু একটাই প্রশ্ন বারে বারে এসে ওর মনটাকে ব্যাতিব্যাস্ত করে তুলল, 'এই কি প্রেম?'

দেখতে দেখতে আবার সরস্বতী পূজো এসে গেলো। বাড়ীতেই পূজো হয় শান্তনুদের। বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই মূর্তি গড়তে শুরু করেছে ও। এবছর যেন অন্যান্য বারের থেকে আরো বেশী উৎসাহ ওর, কেনো, তা ও জানে না। অনেক কষ্ট করে আরতিকে আসতে রাজি করিয়েছে ও - পূজোতে যোগ দেওয়ার জন্য নয়, ওর হাতের বানানো মূর্তি দেখানোর জন্য। পূজো শুরু হয় হয়, এমন সময় আরতি এসে পৌছলো। মুখে সেই অনবদ্য হাসি। বাড়ীর সবার সাথে আলাপ পরিচয় হওয়ার পর ওরা ঠাকুরঘরের দিকে গেলো। ঘরে ঢুকে হঠাৎ আরতি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। একী! একি দেবী সরস্বতীর মূর্তি, না যেন সে নিজেই নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে? শান্তনু ঠিক বুঝতে পারলো না। একটু প্রকৃতিস্থ হলে পরে আরতি বুঝলো যে নিজের অজ্ঞাতে অগোচরে শান্তনু যেন দেবীর মুখের রুপ দিতে গিয়ে ওর মুখটাই বসিয়ে দিয়েছে! মুখে কোনদিন যা বলতে চেয়েও পারেনি, নিজের শিল্পের মাধ্যমে যেন শান্তনু ওর প্রতি সেই ভালোবাসার অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেছে। শান্তনুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলো ও। বলল, 'তুই আমাকে এত ভালোবাসিস? আমার মুখটাই ছিলো আমার সবচেয়ে মন খারাপের কারন। আমি শুধু রাগ করতাম, ভগবান কেনো আমাকে আর পাঁচটা মেয়ের মতো সাধারণ করেনি? কেনো সবাই শুধু এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে? কেনো আমার

বাইরেটা নিয়েই শুধু তাদের এত হইচই? আজ আমার সব দুঃখ ঘুঁচে গেছে। মনে হচ্ছে, আমার থেকে খুশি বোধহয় আর কেউ নেই।'

পরীক্ষার ফল বের হলো। ওরা দুজনেই নিজের নিজের বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলো। দুজনেরই রেজাল্ট প্রথম দশজনের মধ্যে। আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার জন্য দুজনেই দরখাস্ত করলো আর স্কলারশীপও পেয়ে গেলো।

আজ আবার শান্তনু এসেছে আরতিদের বাড়ীতে। সবাইকে চমকে দিয়ে আরতির বাবা ওকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর গলাটা যেন হঠাৎ ধরে এসেছে। অনেক কষ্টে মুখে একটু হাসি এনে বললেন, 'আগে তোমার বাবা মায়ের সাথে আমরা দেখা করতে যাবো, তারপর আর কোন কথা'। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আরতি লাজুক লাজুক ভাবে হাসতে লাগল।

কবি ও কবিতা

সুস্মিতা মহলানবীশ

কবি আর কবিতা একজোড়া প্রেমিকা
কবির আসক্তি কবিতার সর্বাঙ্গ ঘিরে,
কবিতা ধরা দিতে চায় না - থাকে দূরে সরে।

কবিতার গতি স্বচ্ছ, সহজ ও সরল
কবির উন্মত্ত চাহনি কবিতাকে খুঁজে পায় না,
নিশাচর কবি ছুটে চলে বাঁশবাগানে, ঝাউবনে
কখনো বা লেকের ধারে নদীর পাড়ে,
উচ্চরোল দিয়ে বলে - 'ধরা দাও, ধরা দাও প্রেয়সী আমার'।

ক্ষুধার্ত বিনিদ্র পিপাসিত কবি
কবিতা বিহীন ব্যর্থ প্রেমিক
হতাশায় বিস্বাদে তেতোমুখ নিয়ে
শুয়ে থাকে চাদর চাপা দিয়ে ।

হৃদয়ের অন্তরালে

সুতপা দত্ত

শুকিয়ে ঝড়ে পড়ে ভালবাসার ফুল
মালা লুটিয়ে পড়ে মাটিতে
গন্ধহীন সেই মালা হাতে
জেগে থাকি সজ্জা পাশে -
তোমারি পথ চেয়ে।

শব্দহীন নক্ষত্র রাতে
দৃষ্টিহীন আমি অপলক
নিদ্রাহীন চোখ আমার
বসে থাকি জানালা পাশে।

শুনি নিশাচরের সুর
গেয়ে চলে সাথি হারা বেদনার তান
জোনিকিরা আলো জ্বেলে যায় -
বলে যায় সে ছিল আমার আলেয়া।

মন আমার কেবলি বলে -
তুমি আসবে ফিরে
সমস্ত পৃথিবীর ভালবাসার শক্তি দিয়ে
আমার ক্ষুধার্থ হৃদয়ের অন্তরালে।

আগন্তুক

গীতা সেন

টেবিল ল্যাম্পের আলোয় একমনে ঘাড় গুঁজে লিখছিলো সুকান্ত। সম্পাদক ঘন-ঘন তাড়া দিচ্ছেন। যে ভাবেই হোক উপন্যাসটা আজ শেষ করতেই হবে। শুভাঙ্গী তিন বছরের রিমঝিমকে নিয়ে দিন কয়েকের জন্য বাপের বাড়ী গেছে। যদিও বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, তবু ও লেখার এই সুযোগটা ছাড়তে চায়না ও। রিমঝিমকে অজস্র প্রশ্ন ও অকারণ বকবককের উত্তর দিতে গিয়ে ওদের দুজনকেই সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। তখন লেখার প্লটগুলো সুকান্তর মাথায় কুন্ডলী পাকাতে থাকে কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ পায় না। তাই আজকে এই সময়টা কাজে লাগাতেই হবে ভেবে ও লিখতে বসেছে।

কলিং বেলের আওয়াজ হতে বিরক্তিতে ও বলে ওঠে, 'এখন আবার কে এলো?' বার তিনেক বেল বাজবার পর দরজা খুলতেই হ'ল। বারান্দাটা অন্ধকার। কাল থেকেই এখানকার বাল্‌বটা ফিউজ্ হয়ে আছে। বদলাবার কথা সারা দিনে মনেও পড়েনি। আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও মনে হ'ল একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে।

-'কে?'

-'আমি।'

-'আমি কে?'

-'চিনতে পারছো না? আমি শকুন্তলা।'

-'শকুন্তলা? তুমি এখানে এলে কি করে? ওরা তোমাকে আসতে দিলো?'

-'ওরা কি আর আসতে দেয়? আমি পালিয়ে এসেছি। আমি জানতাম, একদিন না একদিন আমি তোমাকে খুঁজে পাবোই।' শকুন্তলার গলায় খুশী থরথর ক'রে কাঁপছে।

-'কবে এসেছো?' সুকান্তর গলায় অসন্তোষ স্পষ্ট।

-'তা প্রায় মাস পাঁচেক। '

-'এতদিন কোথায় ছিলে?'

-'কিছুদিন রেলওয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মে, তারপর.... থাক্ সেসব কথা শুনলে তুমি কষ্ট পাবে। '

-'আমার ঠিকানা পেলে কি করে?'

-'অনেক কষ্ট করে, অনেক কষ্ট করে। আগে একটু বসতে দাও।'

দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো সুকান্ত, -'এসো, ভেতরে এসো।' শকুন্তলা বুঝতে পারছিলো, ওকে দেখে সুকান্ত খুশী হয়নি, বরং বিরক্ত হয়েছে, তাই ওর কথায় আন্তরিকতা নেই, আছে নির্মমতা।

-'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। এক গ্লাস জল খাওয়াবে?' সামনের একটা মোড়ায় বসে পড়লো শকুন্তলা। টেবিলে ঢাকা জলের গ্লাসটা শকুন্তলার দিকে এগিয়ে দিলো। ঘরের আলোয় শকুন্তলার দিকে চেয়ে গাটা ঘিনঘিন করে উঠলো ওর। এই কি সেই ঝকঝকে টকবকে সুন্দরী সুবেশা শকুন্তলা? মাথায় একবাঝা রুক্ষ, ময়লা চুল। পরণের শাড়ীটা বিবর্ণ আর শতছিন্ন। অযত্ন আর দরিদ্রের ছাপ ওর সর্বাঙ্গে।জল খেয়ে গ্লাসটা সামনের সেন্টার টেবিলটায় রেখে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বললো, -'এবার বলি আমার সব কথা।'

-'সব কথা আমি জানতে চাই না। শুধু জানতে চাই আমার ঠিকানা তুমি কোথায় পেলে।'

-'সব ঘটনা না বললে তুমি বুঝবে না।'

-'বল্‌লাম তো, সব ঘটনা জানার কোন আগ্রহই আমার নেই,'

-'তুমি জানতে না চাইলেও আমি জানাতে চাই।'

-'কোন প্রয়োজন নেই। প্রথমটা তো আমি জানিই। শেষটাও তোমাকে দেখে আন্দাজ করা কঠিন নয়। আমার হাতে সময় খুব কম। এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কি সেটা খুলে বলো।'

-'উদ্দেশ্য একটাই, আমি আমার স্বামি সংসার ফীরে পেতে চাই।'

-'অসম্ভব। এখন আর তা হয়না। এত ঘটনা হবার পরেও তুমি সব ফিরে পাবার আশা করো?'

-'কেন করবোনা? মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার সময় তোমার চোখের সামনে থেকে একদল পশু আমাকে জোর করে তোমার চোখের সামনে থেকে টেনে নিয়ে গেলো..... সে দোষ কি আমার?'

-'আমি তো বলিনি তোমার দোষ। বলতে পারো ভাগ্যের দোষ। সে যাই হোক, যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে --এখন আর তুমি..... ' থেমে গেল সুকান্ত।

শ্লেষের হাসি হেসে শকুন্তলা বললো, 'থেমে গেলে কেন? আমি অশুচি তাই না? শুধু কি মেয়েরাই অশুচি হয়? পুরুষরা বুঝি চিরশুচি হয়? সোজা কথাটা আর বলতে পারছোনা কেন? আমাকে তুমি আর স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারবে না।'

-বুঝতেই যখন পারছো, তখন আর শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে লাভ কি?'

-'লাভ? ও কথাটা তো আমার জীবান থেকে মুছে গেছে। এখন তো শুধু ক্ষতির পালা। টেবিলে রাখা ছবিটা নিশ্চয়ই তোমার বর্তমান স্ত্রী আর মেয়ের? তুমি যে এখন পুরোপুরিই সুখী, তা তোমার চেহারাই বলে দিচ্ছে। তুমি ঠিকই বলেছো, এখন আর তা হয়না। এখানে আমার জায়গা কোথায়? ভয় নেই, নিজের ঘর ভেঙেছে বলে তোমার ঘর আমি ভাঙবো না। শুধু একটা কথা ভেবে আমি অবাক হচ্ছি, মানুষ কত তাড়াতাড়ি বদলে যায়। আজ আসি, ভালো থেকো।' দরজার বাইরে পা বাড়ালো শকুন্তলা।

-কোথায় যাবে?' নিজের অজান্তেই বলে ফেল্‌লো সুকান্ত।
ম্লান হেসে শকুন্তলা বলে, 'জানি না।'
-'তোমার যদি কিছু টাকার প্রয়োজন থাকে, তাহলে.....'
-'প্রয়োজন তো আছেই। তবে তোমার কাছ থেকে নেবো না। তোমার সাথে দেখা হয়ে একটাই লাভ হ'ল, বুঝতে পারলাম- লেখকের কলম যা বলে, তার জীবন সব সময় তা বলে না। তা যদি না হ'ত, তবে ধূসর-চাঁদ উপন্যাসে তুমি যা লিখেছো, নিজের জীবনে তা করতে পারলে না কেন? সবিতার জন্য সুখময় দশ বছর অপেক্ষা করেছিলো। সবিতার জীবনেও তো প্রায় আমার জীবনের মত ঘটনা ঘটেছিলো। তবু সুখময় তাকে অশুচি মনে করেনি। কারণ সবিতার তো কোন দোষ ছিলনা! ঐ উপন্যাসটা লিখেই তুমি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলে, মনে আছে? চলি।'

গেটের দিকে এগুয়ে গেলো শকুন্তলা। সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে চাইলো সুকান্ত, 'আমার এই কথাটা তুমি শুনে যাও শকুন্তলা, আমার লেখক হয়ে ওঠার পেছনে ছিলো তোমার প্রেরণা, একথা আমি ভুলিনি। সত্যিই আমি সুখময় হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। সুখময়ের চরিত্র নিজের হাতে সৃষ্টি করেও আমি নিজেকে সুখময় ক'রে তুলতে পারিনি। তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার মত মুখও আমার নেই শকুন্তলা।' এক অদৃশ্য শক্তি এসে কণ্ঠরুদ্ধ করে দিলো ওর। কিছুই বলা হ'ল না।

একবুক ঘৃণা আর অভিমান নিয়ে শকুন্তলা ফিরে গেলো এক অজানা পথের উদ্দেশ্যে। শুধু বারবার ওর মনে হতে লাগলো, কলম দিয়ে যা লেখা যায়, জীবন দিয়ে তা প্রমান করা বড়ই কঠিন।

একটি প্রবাসী কবিতা

অমিতাভ সেন

শুন্য নীল আকাশ মাঝে
ছোট্ট মডেল প্লেন ওড়ে --
সেথায় এখন বৃষ্টি ঝড়ে

এখানের চিরবসন্তে
বইছে শুধু গরম হাওয়া --

নেই সেখানের ভিজে ঘাসের
ঘ্রাণের মাঝে বসে বসে
শুধুই তোমার পথ চাওয়া ।

অদেখার দেখা

জবা চৌধুরী

রোজ তোমার করে দেখি,
আজ তুমি দেখো আমার মতো করে।
তোমার নিত্যকালীন অভ্যাসের দেখা,
প্রয়োজনে, অযাচিতভাবে, পরিমিত সময়ে।
মূল্য বোঝাই কেমন করে ?
আজ তুমি আমার দেখায় দেখো প্রাণভরে।

তোমার সীমাবদ্ধতা আমাকে যেন ভাবায়।
যে দেখার প্রয়োজনে নিত্য আমাদের দেখাশোনা
হঠাৎ না দেখার উপলব্ধিটা কি খুব ই সুখের ?
বোধহয় আবার ভুলে যাবে না-দেখার পালা শেষ হলে !

তবুও তো এ আমারি একান্ত ব্যক্তিগত জয়।
যাকে দেখার মাঝে কোনো প্রাপ্তি নেই
অদেখার মাঝে চিরঅপ্রাপ্তির বোধটা যেন প্রবল ।
এ দেখা ভালো লাগার, না মন্দ লাগার ?

বোধহয় কোনোটাই নয় ।
সাময়িক দূরত্বের বৈষয়িক ব্যস্ততায়
জীবনের নিয়মিত আশংকায় এ যে অভ্যাসের দেখা ।
মূল্য বোঝা যায় না দেখাতে ।
তাই তো দেখবো বলে তোমায় দেখি না,
দেখিনা সুন্দর অসুন্দরের পরকাষ্ঠায়
যখন না দেখার হতাশায় আমাকে হারাও বারেবারে
সেইদিন হয়তো বা এক মুহূর্তের মাঝে বোঝা যায়
মূল্যবিহীন এই নিত্য দেখায় লুকিয়ে আছে
না দেখার অমূল্য বেদনা ।

The Einstein of Music and his Legacy

Amitava Sen

Just as the personal computer and the Internet have made us writers and publishers, the synthesizer has made us musicians and composers—and Dr. Robert A. Moog, who passed away at his home in Asheville, North Carolina, on August 21, 2005, was the Godfather of the modern synthesizer.

Some say he was the "Einstein of Music." Without his invention, the world of music would have been very different today: his legacy has shaped all genres of music from rock to techno, classical to hip hop, fusion, and new age, to virtually everything you hear nowadays coming out of the recording studio. In his own words, "keeping in constant touch with musicians from all fields of music and from all over the world" enabled him "to design instruments that have proven to have enduring musical worth." He won the Polar prize, Sweden's "music Nobel prize," in 2001.

Bob Moog started building Theremins with his father in 1954, and after he published an article in the January 1961 issue of the magazine 'Electronics World,' he sold around a thousand Theremin kits out of his three-room apartment. His friendship with experimental composer Herbert Deutsch led to the development of the Moog Modular Synthesizer, which debuted in 1964. By the time he received a graduate degree (PhD in Engineering Physics, Cornell University) in the summer of 1965, the R. A. Moog Co. had delivered several modular synthesizer systems, mostly to academic and experimental composers.

But it was Wendy Carlos' "Switched on Bach," performed exclusively on Moog's modular, which popularized the synthesizer in 1968. The Beatles used a Moog synthesizer in their 1969 Abbey Road album. Subsequently, the Moog synthesizer was used by Stevie Wonder, Herbie Hancock, Chick Corea, groups like Pink Floyd, the Doors, the Grateful Dead, the Rolling Stones, Parliament, Funkadelic and the list goes on and on… virtually all professional musicians in all categories of modern music started using the synthesizer in the following decades as it became smaller, lighter, and more affordable. Interestingly, the synthesizer's ability to mimic strings, horns, and percussion also threatened some musicians: in 2004, musicians extracted a promise from the Opera Company of Brooklyn to never use an advanced kind of synthesizer in future productions.

Though setting the standard for analog synthesizers, the Moog Synthesizer Company did not survive. Larger companies such as ARP, Korg, Roland and Yamaha developed Moog's prototypes into more sophisticated and cost effective instruments. Bob Moog returned to his roots and started selling a transistorized version of the Theremin, which enjoyed an early 90's renaissance.

My own interest with the synthesizer began in the mid-70's when, as a student at IIT Kharagpur, I performed Pink Floyd and Beatles numbers in our Western Music band, and learned to fiddle with a sine-wave generator from our Physic lab to mimic the Moog's sound - the actual synthesizer was then beyond our reach. Although the latest machines using digital signal processing and sampled sounds are far advanced in technology from those analog Moog synthesizers of the 70's, let us thank Bob Moog for making this all possible!

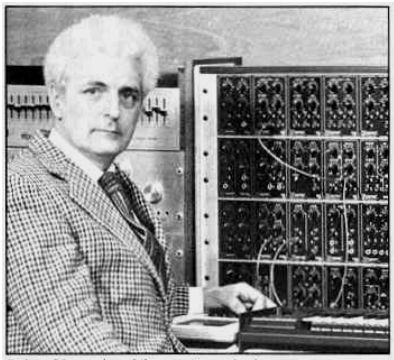

Robert Moog, sire of the music synthesizer.

THE CHALLENGE

A merchant was taking his morning stroll by the seaside when he saw a man squatting on the beach and filling a cup with sand. As the merchant watched, the man emptied the contents on a large pile of sand beside him and began filling the cup again. The merchant went up to him and asked him what he was doing.
"I am Bidhata (Fate)," said the man. "I am measuring out the food each man is to receive today."
"Can you really do that?" asked the merchant. "I challenge you to withhold my midday meal today!"

"As you wish," replied Bidhata.
The merchant bought a fish and took it home and gave it to his wife.
Then he went on to his place of work.
In the afternoon he came home and sat down to eat.

His wife placed the cooked fish before him. "Fate said he would withhold my midday meal," thought the man. "But now who can stop me from eating this delicious fish?" And he burst out laughing.
His wife thought he was laughing at the way the fish had been prepared and she began to scold him. The merchant got angry. He got up and stormed out of the house.
It was only when he cooled down that he realised the significance of what had happened: Fate had succeeded in withholding his share of food for that afternoon.

THE STONE IN THE DESERT

An Arab while crossing a desert came across a huge rock half buried in the sand. Scrawled on the boulder was this inscription:

TURN ME OVER AND YOU WILL BENEFIT FROM IT

The Arab felt sure there was a great treasure hidden beneath it and worked mightily to turn it over.
He succeeded after several hours. But there was no treasure there, only an inscription on the underside of the rock.

The Inscription Was

GREED IS THE ROOT OF ALL EVIL. REMEMBER THIS AND YOU WILL BE A BETTER MAN.

The Sanatana Dharma

Samar Mitra

I have a name. The objects that cover my body have names. My body parts have names. My hometown has a name. The things that I eat have names. The objects all around me have names. In short, the world consists of names and forms. Then there are those that cannot be seen, that is, are formless, but are known to exist because they are within the grasp of our other four senses. Although they have no forms they can be still be identified by their names. Finally, there are those that are beyond the perception of our five senses but within the reach of our mind and intelligence. They are also distinguished by their names alone. One may ask how the names became associated with the objects with or without forms. The answer to that question is that a name usually has a meaning that describes a major characteristic of the object so named. Of course, there are instances when the well known question what's in a name, a rose called by any other name is still etc. can be asked, but more often than not, a word that is used as a name implies the named. That is to say, the name and the named are inseparable. Of course, it is not unusual for a word to have more than one meaning as it may describe multiple traits or characteristics. Dharma, for example, is such a word.

The root from which the word Dharma is derived stands for that which holds. In this sense, every object has at least one Dharma, which represents one of its distinct traits. Thus the power to burn is one of the distinguishable characteristics of fire and therefore, is its Dharma. Fire, of course, has other traits. It gives light, it generates heat, it purifies etc. So fire has more than one Dharma, A tiger hunts to survive, therefore ferocity, among others, is its Dharma and so on. To elaborate this idea it may be noted that Dharma is the support of the universe, that is to say, everything rests on Dharma. In Sanskrit an object is called Padartha, which is a word. But it is more than a word. It has two components, namely Pada and Artha. They stand for a combination of a sound and its meaning. In general, the meaning stands for its Dharma.

Take the word Saraswati as an example. Sara means water and we know that once upon a time there was a beautiful river in Aryavarta or Bharat named Saraswati. The river at present is virtually nonexistent. She supported life, and her peaceful bank used to be inhabited then by sages who performed various religious rites in that serene environment. She was also worshipped as a mother Goddess. The sustenance and the surroundings she provided also enabled the development of noble thoughts and their expression through words or Vak. Thus the Dharma of Saraswati was understood, and as such the Goddess began to be worshipped as Vakdevi.

Consider the word Jagat or world as another example. It is not only a word but is also its Dharma. That is so because the meaning of the word Jagat is that which is always on the move. In other words, motion or Gati is its Dharma and hence it can be said that Jagat is a word and it is also its Dharma. (A slight diversion at this point may not be totally out of context. The fact that Jagat does not stand still, is inherent in the word itself). But it also has other traits. It is the support of beings and things. Therefore, to provide support is

another of its Dharma but that is not apparent from the word Jagat as such. Therefore, another word to represent the world is used, and that is Dharani. This is the beauty of the Sanskrit language (it may indeed be the case with other languages also), and no wonder, different words exist to describe the same object. This provides another argument in favor of the identity of the name and the named as mentioned earlier.

From these illustrations we see that the statement the word Dharma makes to describe an object, is true at all times and in all places, the Sanskrit word for which is Sanatana, Saswata etc. These words were used in Mahabharata (may not be for the first time), in at least three places, twice in Bhishmaparvan, Bhgavadgita 1:42 and 14:27 respectively. In the former, Arjuna talks about Jatidharma and Kuladharma or the social norms prescribed for the Brahmanas, Kshatriyas etc., as well as those of different clans, being Saswata or eternal. In the latter, Sri Bhagavan talks about His being the support, among others, of Saswata Dharma. This means that he is the determiner of the duties and what is right and what is wrong or in other words, He is the maintainer of the stability of the society. In Anusasanaparvan 141:65, the phrase Sanatana Dharma has been used by Lord Maheshwara to describe once again the Varnadharma or the duties of Brahmanas etc. in response to the question asked by His consort Uma.

From the above it is obvious that Dharma and religion are not at all equivalent but the argument that the former includes the latter can be justified. That is why when it is necessary to describe Dharma in terms of religion a qualifier is introduced. From that point of view those who believe in Vedas would prefer the term Vaidik Dharma. Again, since the land was known as Aryavarta in the days of yore, the designation Aryadharma as its religion was also appropriate. Further, since religion in some form or other has been a part of human nature from the beginning of civilization, it has as such, also been named Manava Dharma by Manu. However, times have changed and ever since the inhabitants of Bharat were called Hindus by the Persian invaders (though the word Hindu was not a part of the Sanskrit vocabulary), the label has been accepted in Bharat and the rest of the world. Like many other words of different languages of the world, the word Hindu has become a part of the vocabulary of most other languages. The English dictionary began using the label Hinduism for the religion of the Hindus. The people of Bharat who subscribe to this religion have no qualms calling themselves Hindus and by implication their religion as Hindudharma. A small minority still likes the other labels noted earlier, namely, Aryadharma, Vaidikdharma, Manavadharma as well as Sanatana Dharma.

The last label Sanatana is suggestive of the eternal quality of the tenets of Hindudharma. Since all religions are based on truth, all of them in fact, can be called eternal even though, unlike Hindudharma, many of them have founding fathers. That is so because in so far as truth is concerned, it, by definition, is ever existent and unchangeable but revealed only to the deserving mind. So it needs to be discovered and when it is done by a worthy soul, it becomes a common knowledge like, for example, Einstein's theory of relativity. The Vedas (derived from the root vid which means to know), or the books of knowledge, contain eternal spiritual truths that comprise the principal scriptures of the Hindus. These have no authors but we do have the names of the realized souls to whom the specific mantras that make up the four Vedas were revealed.

The distinctive feature of the Sanatana Dharma or the Hindudharma is that it has set in very unambiguous terms two goals for us to achieve in our lives. These goals are to realize our divinity in this very life and to seek liberation from the bondage of the world. It reminds us time and time again that we are indeed the children of immortality and we are essentially free. Briefly, this is what can be called the essence of Hinduism.

At this stage of human history the technological advancement is continuing at an accelerated rate with no end in sight. However, the eternal quest of man about his identity has yet to produce an alternative answer to the bold proclamation of the sages made at a time when the civilization was at his infancy. How fortunate we are to have inherited that spiritual treasure. It is a wonder that the land of Bharat was and still now is, a fertile breeding ground of such great souls.

But the steps required to achieve the recommended goals are not easy to take, the first among which is strong determination. According to ShriBhagavan, (Bhagavadgita,7:3) , among thousands and thousands of men only a few tries to succeed in reaching the goals, yet among those who try, only a handful gets the joy of fulfillment. It is not easy to achieve those goals in one life, which, among others, seems to validate the theory of rebirth or reincarnation*. ShriBhagavan also assured that those who have undertaken this long and difficult journey will not have to regress but will have more and more opportunities in future births (Bhagavadgita, 6:40-45).

The scriptures abound in ways to reach the goals. Acquiring the knowledge from a realized soul by serving him with respect and reverence is one (Bhagavadgita 4:34). This is perhaps what ShriRamthakur meant by Potiseba or serving the master, as recorded in Vedavani, vol.3, no. 179. The one that seems to be very appropriate at all times and all places, especially for the householders deeply involved in worldly activities, is to have faith and offer to the Lord everything that is done or eaten or whatever is worshipped as sacred or offered as a sacrifice (Bhagavadgita 9:27).

Studying scriptures, and there are many, is fine but not obligatory especially for those who are temperamentally not suited. Further, in most cases, one needs a competent teacher and the qualification to navigate through them. Besides, as Sankaracharya (Vivekachurhamoni, verse 59) has said, without that supreme knowledge mere study of sastras is ineffective. It is also ineffective or unnecessary for him who has the knowledge.

Chaitanya Mahaprabhu made it easier by pleading to complete strangers, “Chant the name of Krishna just once and I shall be yours.”

- According to Kathopanisad 2:2:7, after leaving one body or deha, the jiva or dehin enters another, determined by his past actions or karma as well as knowledge, Also in that oft quoted famous verse of Bhagavadgita 2:22, the dehin discards one body and takes another just as a man wears new dress discarding old worn out one.